OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 324 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 324 - 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভাষা ও শৈলীর অভিনবত্ব : প্রসঙ্গত কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস

ড. গুরুপদ অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID : gurupada.adhikari2011@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Long Sentence, Magic, colloquial dialogue, Romance, Reality, Introvert, complexity, colloquial dialogue.

Abstract
In the 1950s, Kamalkumar Majumdar brought a remarkable innovation to the language of Bengali fiction. He stood apart from the conventional prose style of the time. In his writing, he transcended the material world, journeying into a realm of abstract beauty. He developed a unique sensitivity to words. To grasp his language, one must give importance to every single word, often reading each word multiple times. Readers can easily lose themselves in the romance hidden within his words. His sentences carried complexity, and sometimes they were lengthy. In fact, there was magic concealed within his sentences. He effortlessly juxtaposed Sanskrit words with colloquial dialogue. In this essay, the focus is on discussing the stylistic aspects of his language.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের কিছুটা অবহেলিত কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠী তাঁকে নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি। এর পিছনে ছিল লেখকের ভাবপ্রবণতা ও দুরূহ রচনাশৈলী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রুক্ষ ও রুদ্র পরিবেশে জন্মেও তাঁর উপন্যাসে রূপকথা, রোমান্সরস প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রামজীবনের বস্তুশায়ী মানুষের জীবনচর্যা তুলে ধরতে গিয়েও মাঝে মাঝেই তিনি বস্তুলোক ছেড়ে নির্বস্তুক সৌন্দর্যের অভিসারী হয়েছেন। এর ফলে কাহিনিতে সমন্বয়ের অভাব ঘটেছে। একথা লেখক নিজেও খুব ভালোভাবেই জানতেন। 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে ছোটগল্প প্রকাশের পর সেজন্যই রসিকতা মেশানো আক্ষেপ ফুটে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে –

> "আমার বই উনত্রিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর তিরিশজনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে।"[১]

স্বল্প সংখ্যক পাঠক নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। এই পাঠকরা পুরোমাত্রায় অ্যাকাডেমিক পাঠক। কমলকুমার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনাসমগ্রের ভূমিকায় লিখেছেন, -

> "একটি ছোট অথচ মনোযোগী পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করবেন বলেই যেন কমলকুমার তাঁর কাহিনীগুলিতে ভাষার বর্ম দিন দিন আরও সুদৃঢ় করেছেন।"[২]

আমাদের বর্তমান আলোচনায় কমলকুমারের ভাষাগত অভিনবত্বের দিকটিই উঠে আসবে।

সালটা ছিল ১৯৫৩। কলেজ পাশ তরুণদের নিয়ে তৈরি 'হরবোলা' নামের এক নাট্যদলের পরিচালক ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। একই সঙ্গে এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের বাড়িতে জমে উঠেছিল সাহিত্যিক আড্ডা। দলে ছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আয়ুব, নীহাররঞ্জন রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সহজাত পরিহাসবোধ, বুদ্ধির চাতুর্য ও বাগবৈদগ্ধ্যে কমলকুমার ছিলেন অসাধারণ। এই সময়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। কমলকুমারের টুকরো টুকরো রচনার সূত্রপাত ঘটল এইসময় থেকেই। সারাজীবনে খুব বেশি লেখালিখি তিনি করেননি। এই পর্বে মাত্র আটটি উপন্যাস আর কিছু গল্প লিখেছিলেন তিনি। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো : 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৩৬৯) 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যাম-নৌকা' (১৩৭৮), 'সুহাসিনীর পমেটম', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক'(১৩৮৫), 'খেলার প্রতিভা', 'শবরী মঙ্গল' (১৩৯১)।

প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'-য় তাঁর লেখার জাত ছিল পুরোপুরি আলাদা। যেখানে ভাষাশৈলীর অভিনবত্বের কথা স্মরণ করেছিলেন সমসাময়িক সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, -

> "তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখে আমরা স্তম্ভিত। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। গুরু-চণ্ডালী শব্দ মেশাবার প্রক্রিয়া আর কারুর রচনায় নেই... এবং বাক্যবন্ধও অতি জটিল, বাংলা ব্যাকরণের কোনো নিয়মের ধার ধারে না। ...কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তার লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ক) এবং সবসময় রঙ্গরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়ে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাৎ অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা, অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জাদু।"[৩]

রচনারীতির এই ভিন্নতার কারণে বাংলা সাহিত্যে তিনি হয়ে উঠেছেন 'লেখকের লেখক'।

'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৈজু চাঁড়ালের সংলাপে গ্রাম্যতা ফুটে উঠতে দেখি –

> "ওগো বাবু ইঠাঁই একো জীব আছে হে, ধুক ধুক ধুক ধুক করে, আমার যেটা সেটা লোহার' ইহার পর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'লোহারই বা কেনে, দধীচির অস্তি দিই গড়া, পালোয়ান পালোয়ান বাজ দিই গড়া, গড়া হই গেল? আকন্দ ফুল এমন কি, আমি দেখলে চিনতে লারবো, টুকুন ভাত গরাসে মনে লেয় আকাশ খাইছি। তবু তোমার চোখের জলের ভূতে আমাকে পেল।... হারে বাবু মানুষ, দেখনা কেনে গ্রামে গাঁয়কে হলুদ নিশান দিইছে, ভারী গরম (কলেরা) হ'লতার উপর বলে কার্তিক মাস যমের দক্ষিণ দুয়ার খোলা, কত থানা মুলুক ঠেন মড়া এল, এই দেখনা কেনে দড়িতে গিটদি...' বলিয়া কোমরের দড়ি দেখাইয়া পুনরায় কহিল, 'সব শালা গরমের দেনাদার প্রজাখাতক, কত যে অনাথ হইল তা পাইমাপে আসে না খোঁকা, তাদের দেখলে আর কানতিসনা গো...উই যে শালা উপরে, যে শালা সবার ভিতরে, তার কলম মানতে হবেক...সে বড় কঠিন প্রাণ গো, কোন বোধ নাই, কান নাই, হাত নাই... বিকার নাই-এতবড় সংসারটা ...চালায় হে.আইগো কথা শুনছো তোমরা... মড়ার হাত যে... মাটি ছুঁতে চায়, মাটি হা হা মাংটি..."[৪]

যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত এক অসুস্থ যুবক বিলাস 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাহিনির সূচনা হয়েছে এক স্যানাটোরিয়ামে। বিলাস সেই স্যানাটোরিয়ামে বন্দি। সে দুর্বল। তার দু'চোখে হরিণের চঞ্চলতা, কখনো কবির ভাবাবেগ। অন্তর্মুখী (Introvert) স্বভাবের এই যুবক নিজেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে বড়ো একা বলে মনে করে। মাঝে মধ্যেই সে রোমান্টিক ভাবালুতায় আবিষ্ট হয়। তার কথাবার্তায়, তার অনুভূতিতে আছে কাব্যিকতা। বিলাসের একাকিত্ব বোঝাতে লেখক স্বতন্ত্র উপমাপ্রয়োগ করেছেন। 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের শুরু হচ্ছে চিত্রধর্মিতার মধ্যে দিয়ে –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 324 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই, নিম্নের আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক-আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরম্পরা যেমন দেখা যায়-দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ন মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিখাদে দেই ধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলি ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য! এ কারণেই বিলাস, চমৎকার যাহার রূপ, যে বেশ সুস্থ, এখন অন্যদিকে আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল কেননা এসকল বুদ্বুদ সম্মুখে থাকিয়াও পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু এ-দৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, এ কথা সত্য যে, তাই মনেতে নিশ্চয় সে কুণ্ঠিত কেননা ইতঃপূর্ব্বে অজস্র দিনের আত্মসচেতনতার কুজঝটিকার মধ্যে সে একা বসিয়া কবিতা লিখিবার মনস্থ করে কবি হইবার নয়, যেহেতু, সম্ভবত, রূপকে রূপান্তরিত না করিয়া ভালবাসার শুদ্ধতার দিব্য উষ্ণতা ক্রমে অস্পষ্ট অহঙ্কার পর্য্যন্ত, তাহার ছিল না যদিও - তাহার নিঃসঙ্গতা নাই শুধুমাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল।"[৫]

'গোলাপসুন্দরী' উপন্যাসে তৎসমগন্ধী ক্রিয়াপদ, শব্দবিন্যাস ও দীর্ঘ বাক্যপ্রয়োগের পাশাপাশি উপন্যাসে একেবারে সাধারণ কথ্য সংলাপ প্রয়োগ করেছেন লেখক। উপন্যাস জুড়ে ঘটেছে বেশ কিছু দুর্লভ উপমার ব্যবহার। স্যানাটোরিয়ামে করিডোরের সাদা দেওয়ালকে মনে হয়েছে রমণীর চোখের পলকের মতো। বিলাসের দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে 'সাঁওতাল রমণীরা যেরূপ হাটে আসিয়া আপনার বিক্রয়ার্থে ঠেকাপূর্ণ সামগ্রীর সম্মুখে, মুখে একটি হাত দিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেইরূপ দণ্ডায়মান।' বিলাসের চোখের সৌন্দর্য রাধিকার মতো, চেট্টির এপিটাফে বাঘের গন্ধের উপমা প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কমলকুমার কেন এই জাতীয় ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন? 'গোলাপসুন্দরী' উপন্যাসের ভাষারীতি কিছুটা সরল, পরের দিকের রচনায় ভাষারীতি আরও দুর্বোধ্য এবং জটিল হয়ে উঠেছে। এই প্রশ্ন স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, -

> "এক এক সময় এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন তিনি। যেমন, বাংলা গদ্যের বাক্যবিন্যাস তৈরি হয়েছে ইংরেজির অনুকরণে। কমলকুমারের মতে, যদি বিদেশি রীতি নিতেই হয়, তবে ফরাসি বাক ভঙ্গী অনেক বেশি কাম্য। তিনি ইংরেজি প্রভাব অস্বীকার করে ফরাসী রীতিতে বাংলা গদ্য লেখেন। আবার কখনো বলেছেন, হাটে-বাজারে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে যে ভাষায় আমরা কথা বলি সে ভাষায় সাহিত্যরচনা উচিত নয়। সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা, তাঁর জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়।"[৬]

তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে,

> "এগুলোও বোধ হয় সঠিক যুক্তি নয়। আধুনিক বাংলা গদ্য অনেকখানিই রবীন্দ্র অনুসারী। গদ্যে এই রবীন্দ্র- প্রভাব তাঁর যেমন মনঃপুত ছিল না, তিনি পছন্দ করতেন বঙ্কিমী গদ্যের দৃঢ়তা এবং মনে করতেন বাংলা গদ্য বঙ্কিম - দৃষ্টান্তেই চলা উচিত ছিল। তবুও, সাধু ক্রিয়াপদ আঁকড়ে ধরে থাকলেও, কমলকুমারের গদ্য ঠিক বঙ্কিমী গদ্য নয়, এ তাঁর নিজস্ব তৈরি করা ভাষা। নিজের লেখার জন্য একজন লেখক আলাদা ভাষা তৈরি করে লিখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বেশী নেই।"[৭]

'সুহাসিনীর পমেটম' (১৯৬৫) উপন্যাসটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'পমেটম' শব্দের অর্থ সাজবার সুগন্ধী দ্রব্য। শব্দটি ইংরাজি 'pomatum' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গোটা উপন্যাসে নানাভাবে ভিন্নধর্মী চরিত্রের ভেতর দিয়ে লেখক সৌন্দর্যের অনুধ্যান করেছেন। উপন্যাসটি দৃঢ় সন্নিবদ্ধ, কোথাও কোনো অনুচ্ছেদভাগ নেই। এমনকি, উক্তি- প্রত্যুক্তি পরিবেশনে লেখক কোথাও কোনো ফাঁক রাখেননি। সেইকারণে উপন্যাস পাঠের আগে পাঠকের মনে হৃদ্‌কম্পন শুরু হতে বাধ্য। উপন্যাসটি কড়া পাকের। শুধু বর্তমান যুবসমাজই নয়, যে-কোনো স্তরের পাঠকের কাছেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 324 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এর অর্থভেদ করা দুষ্কর। যদিও এই উপন্যাসে লখাইয়ের মন বড়ো সরল। কাঠবেড়ালির ত্বরিত গতিবিধি, টিয়ার কর্কশ ডাক, থানার ভৈর দফাদারের বাহারে সাইকেল, হ্যাণ্ডেলের চরকি তার মন কেড়ে নেয়। তবে বালকোচিত চাপল্য সত্ত্বেও সে সাহসী, চুরিবিদ্যায় দক্ষ। ভৈর দফাদারের ভীম হুঙ্কারকেও সে ভয় পায় না। বরং হাতের মুদ্রায় সে বোঝাতে চায়, "তুমি আমার ঘণ্টা করবে ভৈর দফাদার... আমি শালা চুরি করে সব বাড়ী ফাঁকা করে দেব... আমাকে ধরবে তুমি"। সে চুরি করে। মাঠে মাঠে সে গোবর কুড়ায়, মায়ের সঙ্গে মাঠে মাঠে শাক তোলে। সে স্বাধীনচেতা, মুক্ত বালক। যোহন তাকে বাবা বলতে বলায় রেগে গিয়ে উদ্ধতস্বরে যোহনকে সে জানায়, 'শালা খ্রেশ্চান ডিসকে পিরীচ বলিস্ আলুভাতেকে আলুভত্তা বলিস্ - তোদের জাত জন্ম আছে-? দাঁড়াও শালা পোষটো বাকসয় (Post Box) আমি সাপ্ পুরে দেব-'। গল্পের প্রেক্ষাপট চব্বিশ পরগণা। মেদিনীপুর থেকে লখাইয়ের মা 'গালচমকি' (আসল নাম নয়) চব্বিশ পরগণায় কামিনরূপে একদিন ধান কাটতে এসেছিল। চব্বিশ পরগণাতেই তার জন্ম হয়। বালক লখাইয়ের জন্ম এক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের ঔরসে। এজন্য বারবার তাকে সমাজের কটূক্তি শুনতে হয়। তার আচরণে আছে ছেলেমি। কখনও সে বুড়ো আঙুল চোষে, আবার কখনও সে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনো বন্ধন সে পছন্দ করে না, মুক্ত জীবনের আশায় সে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সে বিড়ি খায়। যদিও সে ঠিক নেশাখোর নয়। তার মা এক সাধারণ কামিন মাত্র। সে কুৎসিত দর্শনা। তার মুখ বাঁকা, গাল চমকায়। যে কারণে 'গালচমকি' রূপেই সে পরিচিতা।

'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে এসে তিনি প্রথম একটা নিজস্ব ভাষারীতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে-কোনো চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের অভিন্ন বাকচাল তিনি তুলে ধরেন। এইকারণে কমলবাবুর উক্তিপ্রয়োগ হয়ে ওঠে জীবন্ত। লখাইয়ের উক্তি প্রয়োগের মধ্যে তা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। শওকত আলী তাঁর উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'-এ (১৯৮৪) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। এর বয়ন ঘটাতে গিয়ে শওকত আলী ধারণ করেন তৎসম শব্দবহুল একটি ভাষারীতিকে। কমলকুমারের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার লক্ষণ অনায়াসে ফুটে উঠেছে, 'কি ধ্যানা পানা হচ্ছে', 'আমার পিণ্ডি উচ্ছুগ্য করছি', 'মাইরি মায়ের দিব্যি তুমি ভারৱী সুন্দর', 'এই শুয়ার বামুনের ঔরসে নাব' — এখানে বাক্যের মধ্যে একেবারেই দেশজ ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সুহার উচ্চারণে, 'গাছতলা' > 'গ্যাসতলা' হয়েছে। দেশজ উক্তি বা সংলাপ তাঁর বর্ণনা অংশের পাশে বড়োই বেমানান। উত্তম পুরুষে সাধারণ বর্তমানকালে –'লুম' প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঘটেছে। বাগ্‌ধারা প্রয়োগে, অশালীন উক্তিপ্রয়োগে লেখক কোনো লাগাম রাখেননি। গানের বিশেষণ হিসেবে 'ম্যাদাটে' শব্দের প্রয়োগ গ্রাম্যতাকে তুলে ধরে। 'খারাপ' অর্থে 'নসরিয়া আদমি' শব্দবন্ধের প্রয়োগ করেছে সুহা। সুহাকে 'জেলাবী মেয়েছেলে' বলে গালি দিয়েছে যোহন একাদশী। বাপ-মা তুলে কথাবার্তা রুচিবিগর্হিত ঠিকই তবে লেখকের জটিল ভাষারীতির ফাঁকে কাহিনিকে অনেকখানি জীবন্ত আকার দিয়েছে। কোনো কোনো স্থানে পরপর একাধিক অব্যয়ের (যদ্যপি-তত্রাচ, উপরন্তু- অথচ) প্রয়োগে বাক্যের অর্থভেদ করা রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছে। শব্দ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখক কোনো বাছবিচার করেননি। তৎসম শব্দের পাশে তিনি দেশি বা চলিত শব্দ অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন। সাধুরীতির ক্রিয়াপদের পাশে চলিত রীতির ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করেছেন।

শুধু শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, বাক্যের অন্বয় কোথাও কোমল আবার কোথাও কঠিন। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কখনো-কখনো শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় যৌনতার আঁশটে গন্ধ ফুটে উঠেছে। ড্রয়িংরুম বিলাসী কৃত্রিম শব্দের পাশাপাশি তিনি অনায়াস দক্ষতায় দেশজ স্ল্যাং প্রয়োগ করেছেন। ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। ভাষাকে কখনো চড়ায় তুলেছেন, আবার কখনো খাদে নামিয়ে এনেছেন। তাই পড়তে গিয়ে পাঠক মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। ভাষার উচ্চাবচ বা বন্ধুরতার কারণে পাঠককে এ উপন্যাসে বারবার হোঁচট খেতে হয়। এই ধরনের ভাষারীতির নমুনা উপন্যাসে বারবার দেখতে পাওয়া যায়। 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে একটি দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের নমুনা, -

> "সে আপনকার অতীব শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের খাসা সীম বীজ নাসার বেসর যেখানে ঝুটাপান্না – মনলোভা পান্নার ইহকালের অচীন সুদীর্ঘতা বহু সন্তরণে অতিক্রম করত আসিয়া স্থির মূর্ত্ত, উহাতেই দোমনা অঙ্গুলি প্রদান করে এবং এই অঙ্গুলিতেও নির্ঘাত, অবশ্যই, তাহার, সুহার-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 324 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সুহাসিনীর দগ্ধ তীক্ষè রাত্র যাহা মেঘগর্জনের উন্মাদ দাপট ও যুগপৎ ভেককুল আর ঝিঁঝির পরস্পরা ডাক মিশ্রিত ত্রাহি করা দুর্যোগ ফলে, এ কারণে, এহেন ঘোরঘটা যামিনীর মাড়ি পীড়নজনিত যখন এমনও যে উহার, বালিকার ডাগর কালীয়া চতুর দেহ সুতপ্ত – এখন, যদ্যপি যে অল্পবয়সী তত্রাচ তাহার শরীর বৈভব সুকুমার লাল, পুরুষ অভিমানী – আরও যে এই অবয়ব যাহার কক্ষস্থ লণ্ঠনের হেতু দশাসই রুদ্র মখমল পট্টছায়া, মশারি তবু, দর্শনে প্রকৃতই বিশেষ মীনগন্ধবৈধ বাসনায় উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বভাবত যে সম্ভব, যে তথাপিও কোনক্রমেই বুঝে না – উপরন্তু, অথচ এই হয় যে, পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার ঘরের, যাবতীয় কিছুর মধ্য হইতে ছোটলোক, নিম্নশ্রেণীর, মাথার কিটকিটে সুলভ বাসের সহিত শিকে-তোলা হাঁড়িতে জাওলা মাছের ক্বচিৎ চাঞ্চল্য প্রসূত ঘর্মাক্ত তৃপ্তিদায়িনী রতিসুখ আপ্লুত শব্দ উত্থিত হয়, তৎব্যতিরেকেও; তাই নিজেকে-সে – ভাবে দংশিত যন্ত্রনায় মৃদুহাস্যে জড়াইয়া শুইবার প্রোষিতভর্তৃকা ঘুমাইবার ঔৎসুক্যে জিহ্বাও পালট করে নাই, উহা সরসিত নহে, কেননা সে হয় ম্লান, সে বড় অসহায়; সে এই অমানিশীথিনীর সর্বক্ষণব্যাপী তিক্ত নিম্ব গন্ধ পাইয়াছে, তাহার পেলব গাত্রময় মারিগুটিকার বেদনা তাহাকেই আপন নৈকট্য হইতে অপসারিত করে – পুনরায় নিম্বশাখা পত্রযুক্ত বাজনে সে কাতর আর্ত্ত বেচারী...।”[৮]

উদ্ধারচিহ্নের সর্বশেষ তিনটি ডটের দৈর্ঘ্য একশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ ‘সে আপনকার’ দিয়ে যে বাক্যটি শুরু হয়েছে একশত একান্ন পৃষ্ঠার উপন্যাস ‘সুহাসিনীর পমেটম’ এ সেটি বিরামচিহ্ন হিসেবে ড্যাশ, হাইফেন, সেমিকোলন, কমা, ডট, ব্রাকেট, উদ্ধারচিহ্ন প্রভৃতিকে গ্রহণ করলেও একটি পূর্ণ বিরামচিহ্নে পৌঁছোয় উপন্যাসটির সর্বশেষ বাক্যে। কমলকুমার মজুমদারের সাধারণ পরিচিতি এটা হলেও অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রথম গল্প ‘লালজুতো’-য় তিনি ছিলেন রীতিমতো সহজ, স্বাভাবিক। দীর্ঘ আঠাশ বছর ক্রমিক অনুশীলনের পর তিনি স্বতন্ত্র একটা ভাষারীতিতে রচিত ‘সুহাসিনীর পমেটম’-এ পৌঁছান। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ বা ‘সুহাসিনীর পমেটম’ প্রচলিত অর্থে সাধুভাষায় রচিত। ১৩৬৬-র পর কমলকুমার চলিত ভাষা পরিত্যাগ করছেন। সাধুভাষায় তিনি নিজের লেখাকে একটা বিশিষ্ট মাত্রা দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিককালে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষায় এমনি একটি নিরীক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষত ‘বাংলা উপন্যাসে কালান্তর’ গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসের কথা লিখেছেন। যদিও এই উপন্যাস অমিয়ভূষণের আগে রচিত। কিন্তু বিশেষত্বের দাবিদার ততটা নয়, তুলনায়, তাঁর ক্ষুদ্র উপন্যাস ‘মধু সাধুখাঁ’ (১৯৮৮)-তে যে রীতি আমরা দেখি সেই রীতিটিতে প্রথাবিরোধিতার ইঙ্গিতটুকু খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও অমিয়ভূষণের ‘ফ্রাইডে আইল্যান্ড বা নরমাংস ভক্ষণ’ (১৯৮৮) উপন্যাসেও বাক্যগঠনের অভিনবত্ব কমলকুমারের কথা স্মরণ ক্রিয়ে দেয়। যদিও কমলকুমারের ভাষাবিন্যাসের দক্ষতা অনেক বেশি দৃঢ়, অনেক বেশি সংহত একটি নবনির্মিতি বলা যায়। কমলকুমার মজুমদারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা-নির্মাণের যে দীর্ঘ পরিক্রমাটি আমরা লক্ষ করি অমিয়ভূষণে কিন্তু তা ঘটেনি। আসলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখটাই ছিল একটু অন্যরকম। এই ভাষাতেই তিনি অধিকমাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। কমলকুমারের উপন্যাসের আখ্যানের বয়ানে গ্রাম্য অশিক্ষা-অনাচার মুখ্য স্থান নিয়েছে। আঞ্চলিকতা, লোকাচার, অন্ধবিশ্বাস নানাভাবে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। মদন কবিরাজের স্ত্রী সন্তান মারা যাওয়ার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে পোঁতা সন্তানদের উদ্দেশ্যে দুগ্ধসিঞ্চন করে। তুকতাক, জড়িবুটিতে অভ্যস্ত শৈবালী উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মনে রাখতে হবে, কমলকুমার আদ্যন্ত ছিলেন রোমান্টিক। বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে থেকে তিনি যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন, তা বাস্তবকে অতিক্রম করে অলৌকিকতার পথে ধাবিত হয়েছে। এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে বিলাস থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ যোহন একাদশী পর্যন্ত। কাহিনির গতি অত্যন্ত শ্লথ। বিলাসের দু’ চোখে ছিল গ্রামীণ সৌন্দর্য, শরীরে শবযাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও তার চোখে ছিল গোলাপের আশ্চর্য মাখানো। তবে গ্রামীণ সৌন্দর্য অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে ‘সুহাসিনীর পমেটম’ উপন্যাসে। কোনো নাগরিক বিলাসিতা এখানে প্রাধান্য পায়নি। শহুরে জীবনের গণ্ডি থেকে অনেকটাই

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 324 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দূরে বালক লখাই, কিংবা পোস্টমাস্টার অক্ষয়। নগ্নতার মধ্যেও এখানে লেখক অনাবিল সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। তুলনায় 'গোলাপসুন্দরী'-র মধ্যে কোথাও যেন নাগরিক কৃত্রিমতা ফুটে উঠেছে। বিলাসের জামাইবাবু মোহিতের কথার মধ্যে ইংরেজির প্রভাব বেশি। তার সৌখিন কথাবার্তা, আচরণের মধ্যে নাগরিক পালিশ আছে। বিলাস সেখান থেকে যেন অনেকটাই দূরে। যদিও এই উপন্যাসে প্রায় সত্তর বছরের গোলক মিত্তিরের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের তুলনায় তা বড়ো সংক্ষিপ্ত স্থান জুড়ে। বরং চেট্টির মুখে ফরাসি এপিটাফ শুনতে বড়ো বেশি দড় বিলাস। 'দর্পণ' পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'পরিপ্রেক্ষিত' নামক রচনায় কমলকুমার লিখেছিলেন, -

> "ঠাকুর বলেন, 'কথা ইসারা বটে'। এই ইসারা পরম পর্যায় যাহা ওতপ্রোত বাচনিক সত্তা তাহা দেখা দেয়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য 'সুহাসিনীর পমেটম' বা 'শ্যাম নৌকা' আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেককেই আনন্দ দেয় নাই। ঘটনাপ্রবাহকে আমি লেখার উপজীব্য বলিয়া ধরি না, তাই অনেক ঘটনা বহুবার পরিশোধিত হইয়াও আমার নিকট রহিয়া গিয়াছে- যথা 'তমালীর গল্প'।"[৯]

কমলকুমারের চরিত্রেরা বিপদের মধ্যে পড়ে বড়ো বেশি ঈশ্বরনির্ভর হয়ে ওঠে। বালক লখাই থেকে শুরু করে 'গোলাপ সুন্দরী'-র শিক্ষিত মোহিত পর্যন্ত সকলেই। অথচ, বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নগরজীবনের ঘোর বিপন্নতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল, চতুর্দিকে পরিকীর্ণ হয়ে উঠেছিল অজস্র মানুষের লাশ। সেখানে রোমান্টিক লেখক দৈব নির্ভরতা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লেখক হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক জীবন, বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে নেই। বরং গত শতাব্দীর রোমান্টিকতায় তিনি মুগ্ধ, শৈশবের স্মৃতিতে তিনি আবিষ্ট। এইকারণে ভাষারীতির মধ্যে একধরনের রোমাঙ্গ তৈরি করতে হয়। তিনি সময়-সমাজ-পরিস্থিতিকে গল্পের মধ্যে যেমন আড়াল করেছেন, তেমনি চরিত্রের বর্ণনা বিশেষ দেননি। 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে ঔপনিবেশিক অত্যাচারের চেহারা দেখানোর অবকাশ থাকলেও লেখক তা দেখাননি। মানুষের অনুভূতি, পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি অত্যধিক নজর দিয়েছেন। দৃশ্যের চিত্রধর্মী বর্ণনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। একটা অদ্ভুত মোহের মধ্যে পাঠক যেন তন্ময় হয়ে থাকে।

ত্রিশোত্তরকালে বাংলা কথাসাহিত্যে ঢেউ লাগে 'চেতনাপ্রবাহ' ধারায়। মনুষ্য-মনের অবচেতন স্রোতটিকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে তাঁদের ভাষায় এসে পড়ে এক নতুন রূপময়তা। বিশেষ করে এই সময় বুদ্ধদেব বসু কথাসাহিত্যের ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতির মেজাজ আনতে সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। একটু জ্যেষ্ঠ জগদীশ গুপ্তও ভাষারীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সংযত ভাষণের উত্তরসূরি হিসেবে আমরা পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা রাবীন্দ্রিক ভাষাভঙ্গী বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষার মূল কাঠামো হিসেবে চালু ছিল।

> "পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যের ভাষারীতিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন আসে তা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। প্রধানত সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার প্রথম দিকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও পরে স্বাভাবিকতার একটি অঙ্গ হিসাবে সেটি প্রতিষ্ঠা পায়। একসময়ে তা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, বর্ণনাকারীও আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করে ফেলেন —অন্তত যখন আঞ্চলিক ভাষার কোন চরিত্র গ্রহণ করে বর্ণনাকারীর ভূমিকাটি। আর আঞ্চলিক শব্দকে লেখকের নিজের বর্ণনায় ব্যবহার তো বেশ স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। অসীম রায়ের গল্প ও শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোকে বা হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পে এ ব্যাপারটি বেশ লক্ষণীয়। অন্যদিকে বিমল কর, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথাসাহিত্যে কাটাকাটা বাক্যের সাবলীল একটি স্রোত তৈরি হয় যা পাঠকের চিত্তে তৈরি করে কাব্যিক এক অনুরণন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, দেবেশ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখের ভাষা নির্মাণে লক্ষ করা যায় বলিষ্ঠতার এক ছাপ।"[১০]

এ শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও সমান সত্য।

> "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলার তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ফ্রয়েড, এলিস, অ্যাডলার, ইয়ুং প্রমুখের চর্চা বাড়ে। এঁদের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে নর-নারীর

> বৈধ–অবৈধ সম্পর্কের বাইরে গিয়ে আরো বহুমুখী শারীর–মানসিক ভাবনার জন্ম হল। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা কথাসাহিত্যে তার প্রয়োগ দেখালেন। কমল কুমারের বহু গল্পে ও শরীরী প্রেমের তীব্র আকুতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পে শরীর ভাবনা আশ্চর্য এক শিল্প সুষমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের দুঃখময় রেখাকে তিনি তুলনা করেছেন 'দুগ্ধহীন স্তনক্ষুব্ধ' রেখার সঙ্গে।”[১১]

তাঁর 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে এই বক্তব্যের সারসত্য খুঁজে পাওয়া যায়। রক্ত মাংসের এক স্বাভাবিক নারীর শরীরী কামনার নির্ভেজাল বর্ণনা করে বলেন—

> “এ বাড়ির বউটি বয়সে নবীন, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল। ব্লাউজটি পরা, ...দেহ বয়সোচিত ধর্মে উষ্ণ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুন গরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি – যা সিক্ত – তার ঘাড়ে সপ সপ হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়।”[১২]

রক্ত মাংসের স্বাভাবিক মানুষ গুলোকে সব ক্ষেত্রে অশরীরী করে তলার অহেতুক প্রয়াস তাঁর ছিল না। কেউ কেউ তাঁর ভাষারীতির মধ্যে শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের চিত্ররীতির মতো কিউবিজম পদ্ধতির অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে একটা বহুস্তর সমাকীর্ণ, বহুধা বিস্তৃত, বিচিত্র, গভীর ও সমগ্র জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেচেন।

> “আমি ঠিক এনালিটিক কিউবিজমের পক্ষপাতী, এখানে টেনসনে রেখাসকল যতক্ষণ না সৃষ্টি হয় ... লেখার প্রেরণা যখন (সৃষ্টিক্ষমতা বাক্য বড় উচ্চমার্গের) এই ঘটনাপ্রবাহের নিকট যাওয়া আসা করে তখনই গল্পের বস্তুত্বের অনুভব হয়। ইহা স্মর্তব্য যে টেনসন ব্যতীত বস্তুত্বের স্থাবরতা সম্ভব নয়। অবশ্য এই এনালিটিক ব্যাপারের সহিত স্তাঁদালীয় বিশ্লেষণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।”[১৩]

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ', পরম্পরা প্রকাশন, ২০ এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১১। পৃ. ১৫৫

২. উপন্যাস সমগ্র', 'কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১১

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ', পরম্পরা প্রকাশন, ২০ এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১১, তদেব, পৃ. ১৫৪

৪. মজুমদার, কমলকুমার, 'অন্তর্জলী যাত্রা', আনন্দ, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪২, পৃ. ১৪

৫. মজুমদার, কমলকুমার, 'গোলাপসুন্দরী', আনন্দ, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৪, পৃ. ১৩

৬. মজুমদার, কমলকুমার, 'গোলাপসুন্দরী', আনন্দ, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৪, পৃ. ৮

৭. তদেব, পৃ. ৯

৮. দাস, সুব্রতকুমার, 'না-প্রচলিত ভাষায় বাংলা কথাসাহিত্য ও কমলকুমার মজুমদার,' অনুচ্ছেদ পাঁচ, https://bdnovels.org/1408

৯. সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র, (সম্পা), 'বিভাব' (কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা), ১৪১০, কলকাতা-৬৮, পৃ. ২৭

১০. দাস, সুব্রতকুমার, 'না-প্রচলিত ভাষায় বাংলা কথাসাহিত্য ও কমলকুমার মজুমদার,' অনুচ্ছেদ পাঁচ, https://bdnovels.org/1408

১১. মণ্ডল, শিবব্রত, 'কমলকুমারের ছোটোগল্প : বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা', 'সপ্তডিঙা' কালীপূজা সংখ্যা ১৪২৪, Vol. 3 No.1 2017, ISSN : 2395-6054

১২. কমলকুমার, মজুমদার, 'নিম অন্নপূর্ণা' www.boiRboi.com পৃ. ১১৯–২০

১৩. সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র, (সম্পা), 'বিভাব' প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮